অনন্ত মহাবিশ্বের মাঝে মহাজাগতিক পথিক এক

অভিজিৎ রায়

'মানুষ যে দিন বুঝতে পারবে সে এক সামান্য মহাজাগতিক পথিক, সেদিন সে অনুভব করবে অয়োনিয় আবেগকে' অনেক আগেই তা বুঝতে পেরেছিলেন প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ কার্ল স্যাগান। সত্যই মানুষ এক সামান্য মহাজাগতিক পথিক ছাড়া কিছু নয়। যে পৃথিবীর জন্য তার এতো মায়া, এত উচ্ছ্বাস, এতো আবেগ, সে পৃথিবী মহাকাশের হাজারো কোটি গ্রহ নক্ষত্র গ্রহানুপুঞ্জের ভীড়ে হারিয়ে যাওয়া সামান্য গ্রহ বৈ কিছু নয়। তুচ্ছ এ গ্রহের কাঁধে সওয়ার হয়ে মানুষ নামের এই দ্বিপদী প্রাণীটি সূর্যের চারিদিকে সেকেন্ডে ১৬ মাইল বেগে, আর পুরো সৌরজগতকে সাথে নিয়ে সেকেন্ডে ৪২ মাইল বেগে আন্তঃ নাক্ষত্রিক শূন্যতার ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছে যাযাবর পথিকের মত - সে নিজেই হয়ত জানে না! আসলেই তো সে এক যাযাবর মহাজাগতিক পথিক।

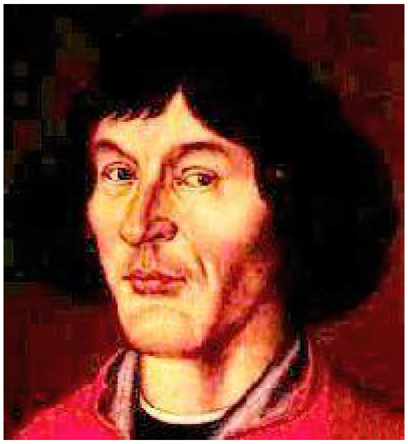
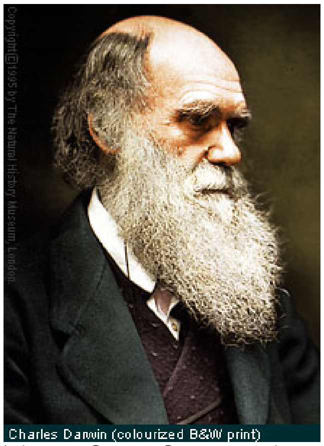

ছবি১: নিকোলাস কোপার্নিকাস, চার্লস ডারউইন : চিন্তার বিপ্লবের দুই কারিগর

আর এ কথাটি খুব ভাল ভাবে প্রমাণ করে দিয়েছেন দু-জন বিজ্ঞানী- একজন হলেন নিকোলাস কোপার্নিকাস, আর অন্যজন চার্লস ডারউইন। কোপার্নিকাসের আগে পৃথিবী নামের এই গ্রহটির একটা যেন বিশেষ মর্যাদা ছিলো সে সময়কার ধর্মবেত্তা, বিজ্ঞানী আর দার্শনিকদের মাঝে। তারা ভাবতেন, আমাদের এ নিটোল বাসভূমি -পৃথিবী বোধ হয় ঈশ্বরের অনুগ্রহপ্রাপ্ত এক 'বিশেষ গ্রহ' আর মহাবিশ্বের সবকিছুই বুঝি এই পৃথিবীকে ঘিরেই অনবরত পাক খেয়ে চলছে। প্রচলিত ধর্মগ্রন্থগুলোতেও কিন্তু আমরা সে ধারণারই প্রতিফলন দেখি। কোপার্নিকাসই প্রথম বৈজ্ঞানিকভাবে গদা চালালেন মূঢ় বিশ্বাসের এ অচলায়তনে। তিনি প্রমাণ করলেন পৃথিবী সে অর্থে মোটেই কোন 'বিশিষ্ট' গ্রহ নয়, বরং বুধ-শুক্র-মঙ্গল-বৃহস্পতিদের মতই সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণরত আরেকটি সামান্য গ্রহমাত্র। আজকে একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে মনে হতে পারে -এ তত্ত্ব তো খুব সহজ-সরল আর সাধারণ, কিন্তু সে সময়কার খ্রীষ্টিয় চার্চ তা সহজভাবে নেয়নি। এ তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে গ্যালিলিও আর ব্রুনোর মত বিজ্ঞানীদের সইতে হয়েছে নির্যাতন, বিশেষতঃ ব্রুণোকে তো পুড়েই মরতে হয়েছে। কারণ, চার্চ মনে করেছিলো, কোপার্নিকাস সৌরজগতের কেন্দ্র থেকে পৃথিবীকে সরিয়ে ফেলায় পৃথিবীর 'বিশিষ্টতা' ক্ষুন্ন হয়েছে! আর তা ছাড়া পৃথিবী যে স্থির আর সৌরজগতের কেন্দ্রে তা বাইবেলে পরিস্কারভাবে লেখা আছে যে! ঈশ্বর কি

ভুল বলেন নাকি? তারপরও কিন্তু ধীরে ধীরে বাইবেল থেকে মুখ তুলে মানুষেরা সামনে এগিয়ে যেতে পেরেছে; আস্থা রাখতে পেরেছে বরং বিজ্ঞানের উপর। তারা বুঝতে শিখেছে, ধর্মগ্রন্থে কোন কিছু লেখা থাকলেই ঢালাওভাবে বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই, প্রকৃতির বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে এর চাইতে বরং সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের কথা ঢের আকর্ষনীয়, অনেক বিশ্বাসযোগ্য। কূপমন্ডুকতার জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে এই যে বুঝতে পারা পৃথিবী কোন কিছুর কেন্দ্র নয়, না সৌরজগতের, না মহাবিশ্বের, বরং এক অতি সাধারণ নক্ষত্র সূর্য যার নাম - তার চারিদিকে প্রদক্ষিণরত এক তুচ্ছ গ্রহমাত্র - মানব সমাজে চিন্তা চেতনার এই ক্রমশ উত্তোরণকে এখন 'কোপার্নিকাসীয় বিপ্লব' নামে অভিহিত করা হয়।

চিন্তা চেতনায় একই ধরনের বিপ্লব ঘটিয়েছেন ডারউইনও, তবে পদার্থবিদ্যা নয় -জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। তাঁর বিপ্লব তো আরো ব্যাপক। যে মানুষকে ধর্মবাদীরা এতোদিন ধরে কল্পনা করেছেন 'ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি' হিসেবে, ভেবে নিয়েছেন বিধাতার এক ব্যতিক্রমী অনন্য সৃষ্টি হিসেবে- সে মানুষকে ডারউইন এক ধাক্কায় নিয়ে গেছেন ওই শিম্পাঞ্জীকূলের কাছাকাছি। দার্শনিক ডেনিয়েল ডেনেট ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে, এটি এক 'ডেঞ্জারাস আইডিয়া'। এটি ডেঞ্জারাস- কারণ এটি বলে যে, মানুষ এবং অন্যান্য প্রানী, কোন উপরওয়ালার নির্দেশনা ছাড়াই, শুধমাত্র প্রাকৃতিক পদ্ধতির মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত সরল প্রাণ থেকে ক্রমান্বয়ে উৎপত্তি লাভ করেছে; কাজেই মানুষ ঈশ্বরের কৃপাধন্য আলাদা কোন 'বিশেষ সৃষ্টি' নয়, বরং বিবর্তনের ধারাবাহিকতার ফসলমাত্র। আজও ডারউইনের এই বিপজ্জনক তত্ত্বটি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। এই পর্যায়ে হাক্সলির সেই ঐতিহাসিক কাহিনীটি আরেকবার পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিলে মন্দ হয় না। একবার এক সভায় বিবর্তনের তীব্র বিরোধিতাকারী খ্রিস্টান ধর্ম বিশপ স্যামুয়েল উইলবারফোর্স ডারউইনের তত্ত্বকে ঈশ্বরবিরোধী ব্যক্তিগত মতামত বলে প্রবল আক্রমণ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি সভায় উপস্থিত বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানী হাক্সলিকে হেয় করার উদ্দেশ্য নিয়ে জানতে চান তার দাদা এবং দাদীর মধ্যে কে আসলে বানর ছিলেন। তার উত্তরে হাক্সলি বলেন যে,

> 'যে ব্যক্তি কুসংস্কার ও মিথ্যার পদতলে নিজেকে বলি দিয়ে বৌদ্ধিক বেশ্যাবৃত্তি করে, তার বংশধর না হয়ে আমি বরং সেইসব নিরীহ প্রাণীদের উত্তরসুরী হতে চাইবো যারা গাছে গাছে বাস করে, যারা কিচিরমিচির করে ডাল থেকে ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়।

শুধু ডারউইন বা হাক্সলির জীবনকালেই নয় - ডারউইনের তত্ত্ব এখনো সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞান বনাম অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে যুদ্ধের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

কোপার্নিকাস আর ডারউইনের ধারাবাহিকতায় আজকের দিনে আধুনিক পদার্থবিদের আরেকটি ক্রমিক বিপ্লবাত্মক মতবাদ হল মালটিভার্স বা অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণা। এই ধারণাটি কেবল পৃথিবী, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, গ্যালাক্সি গুলোকে তুচ্ছ বলে দিয়েই থামছে না, বরং বলছে এই যে আমাদের পরিচিত মহাবিশ্ব - এটিও কোন অনন্য বা ইউনিক কিছু নয়, বরং এমনি ধরনের হাজারো মহাবিশ্ব হয়ত ছড়িয়ে আছে যেগুলো সম্পর্কে আমরা একদমই জানি না। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েল সোসাইটি রিসার্চ প্রফেসর মার্টিন রীস উদ্বেলিত হয়ে বলেছেন :

> *"This new concept is, potentially, as drastic an enlargement of our cosmic perspective as the shift from pre-Copernican ideas to the*

realization that the Earth is orbiting a typical star on the edge of the Milky Way."

অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণাটি কোন ঠাকুরমার ঝুলির রূপকথা নয়, নয় কোন স্টারট্রেক মুভি বা আসিমভের সায়েন্সফিকশন। অতি সংক্ষেপে অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণাটিকে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যক্ত করা যায় এভাবে :

> *আমাদের মহাবিশ্ব যদি কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে স্থান-কালের শূন্যতার ভিতর দিয়ে আবির্ভূত হয়ে থাকে, তবে এই পুরো প্রক্রিয়াটি কিন্তু একাধিকবার ঘটতে পারে, এবং হয়ত বাস্তবে ঘটেছেও। এই একাধিক মহাবিশ্বের অস্তিত্বের ব্যাপারটি প্রাথমিকভাবে ট্রিয়ন আর পরবর্তীতে মূলতঃ আদ্রে লিন্ডের গবেষণা থেকে বেরিয়ে এসেছে। বলা হয়ে থাকে সৃষ্টির উষালগ্নে ইনফ্লেশনের মাধ্যমে সম্প্রসারিত বুদ্বুদ (Expanding Bubbles) থেকে আমাদের মহাবিশ্বের মতই অসংখ্য মহাবিশ্ব তৈরী হয়েছে, যেগুলো একটা অপরটা থেকে সংস্পর্শবিহীন অবস্থায় দূরে সরে গেছে। এ ধরনের অসংখ্য মহাবিশ্বের একটিতেই হয়ত আমরা অবস্থান করছি অন্য গুলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে একেবারেই জ্ঞাত না হয়ে।*

মাল্টিভার্স বা অনন্ত মহাবিশ্বর ধারণা কিন্তু শেলের মতই আঘাত করেছে 'ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন'-এর প্রবক্তাদের বুকে। ব্যাপারটি বোঝাবার আগে আই.ডিওয়ালাদের সম্পর্কে এই ফাঁকে কিছু কথা বলে নেই। পাঠকরা নিশ্চয় অবগত যে, সম্প্রতি বেশ কিছু দার্শনিকদের পক্ষ থেকে নতুন কিছু যুক্তির অবতারনা করে একটু ভিন্নভাবে মহাবিশ্বের অস্তিত্বের কারণ খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে । এঁদের যুক্তি হল, আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ড এমন কিছু চলক বা ভ্যারিয়েবলের সূক্ষ্ম সমন্বয়ের (Fine Tuning) সাহায্যে তৈরী হয়েছে যে এর একচুল হের ফের হলে আর আমাদের এ পৃথিবীতে কখনই প্রাণ সৃষ্টি হত না।

ধরা যাক মাধ্যাকর্ষণের কথা। নিউটন তার মাধ্যাকর্ষণ সূত্রে একটি ধ্রুবক ব্যবহার করেছিলেন যাকে আমরা বলি নিউটনীয় ধ্রুবক, বা গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট । নিউটন তার সেই বিখ্যাত সূত্রে দেখিয়েছিলেন, দুটো বস্তুর মধ্যে আকর্ষণবলের পরিমান ঠিক কতটা হবে সেটা নির্ণয়ে এই গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট নামের রাশিটি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদি ওই ধ্রুবকটির মান এখন যা আছে তা না হয়ে অন্যরকম হত আকর্ষণ বলের পরিমাণও যেত বদলে। সাদা চোখে মনে হবে যে ব্যাপারটা সামান্যই, আকর্ষণ বল বদলালেও বোধ হয় তেমন কিছু যাবে আসবে না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন, ওই ধ্রুবকের মান আসলে আমাদের এই পরিচিত বিশ্বব্রহ্মান্ডের প্রকৃতি নির্ধারণ করছে। ওটার মান এখন যা আছে তা না হয়ে যদি অন্য ধরণের কিছু হত তা হলে এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডটাই হত অন্যরকম। ওই ধ্রুবকের মান ভিন্ন হলে তারাদের মধ্যে হাইড্রোজেন নিঃশেষিত হয়ে হিলিয়াম উৎপাদনের মাত্রাকে দিত বদলে। হাইড্রোজেন-হিলিয়ামের পর্যাপ্ততা শুধু এই গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট এর উপরই নয়, মহাকর্ষ এবং দুর্বল পারমানবিক বলের মধ্যকার শক্তির ভারসাম্যের উপরও অনেকাংশে নির্ভরশীল। যেমন, তারা দেখিয়েছেন, দুর্বল পারমানবিক বলের শক্তি যদি একটু বেশী হত, এই মহাবিশ্বে পুরোটাই মানে শতকরা একশ ভাগ হাইড্রোজেনে পূর্ণ থাকত, কারণ ডিউটেরিয়াম (এটি হাইড্রোজেনের একটি মাসতুত ভাই, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'আইসোটোপ') আর হিলিয়ামে পরিণত হবার আগেই সমস্ত নিউট্রন নিঃশেষ হয়ে যেত। আবার দুর্বল পারমানবিক বলের শক্তিমত্তা আরেকটু কম হলে সারা মহাবিশ্বে শতকরা একশ ভাগই হত হিলিয়াম। কারণ সে ক্ষেত্রে নিউট্রন নিঃশেষিত না হয়ে তা উৎপন্ন প্রটোনের সাথে যোগ দিয়ে হাইড্রোজেন তৈরীতে বাঁধা দিত। কাজেই এ দু' চরম অবস্থার যে কোন একটি সঠিক হলে মহাবিশ্বে কোন নক্ষত্ররাজি তৈরী

হওয়ার মত অবস্থাই কখনও তৈরী হত না, ঘটত না আমাদের এই মলয়শীতলা ধরনীতে কার্বন-ভিত্তিক প্রাণের নান্দনিক বিকাশ। আবার, বিজ্ঞানীরা ইলেকট্রনের ভর মাপতে গিয়ে দেখেছেন এই ভর নিউট্রন-প্রোটনের ভরের পার্থক্যের চেয়ে কিছুটা কম যার ফলে তারা মনে করেন, একটি মুক্ত-নিউট্রন সহজেই প্রোটন, ইলেকট্রন ও অ্যান্টি-নিউট্রিনোতে পরিনত হতে পেরেছে। যদি ইলেকট্রনের ভর সামান্য বেশী হত, নিউট্রন তাহলে সুস্থিত হয়ে যেত, আর সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপন্ন সমস্ত ইলেকট্রন আর প্রোটন সব একসাথে মিলে-মিশে নিউট্রনে পরিনত হয়ে যেত। এর ফলে যেটা ঘটত সেটা আমাদের জন্য খুব একটা সুখপ্রদ কিছু নয়। সে ক্ষেত্রে খুব কম পরিমানে হাইড্রোজেনই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকত আর তা হলে নক্ষত্রের জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানীই হয়ত খুঁজে পাওয়া যেত না। জন ডি. ব্যরো এবং ফ্রাঙ্ক জে. টিপলার এ ধরনের নানা ধরনের রহস্যময় 'যোগাযোগ' তুলে ধরে একটি বই লিখেছেন ১৯৮৬ সালে, নাম- 'The Anthropic Cosmological Principle'। তাঁদের বক্তব্য হল, আমাদের মহাবিশ্বে গ্র্যাভিটেশনাল অথবা কসমলজিকাল ধ্রুবকগুলোর মান এমন কেন, কিংবা মহাবিশ্বের চেহারাটাই বা এমন কেন হয়েছে তার উত্তর পেতে হলে ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে পৃথিবীতে প্রাণ এবং মানুষের উপস্থিতির দিকে তাকিয়ে। পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির জন্য সর্বোপরি মানুষের আবির্ভাবের জন্য এই মৌলিক ধ্রুবক আর চলকগুলোর মান ঠিক এমনই হওয়া দরকার ছিল - সে জন্যই ওগুলো ওরকম। দৈবক্রমে ওগুলো ঘটে নি, ররং এর পেছনে এক বুদ্ধিদীপ্ত সত্তার (বিধাতার) একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। মানুষকে কেন্দ্রে রেখে বিশ্বব্রহ্মান্ডের নিয়ম-নীতিগুলোকে ব্যাখ্যা করবার এই যুক্তিকে বলা হয় 'অ্যানথ্রোপিক আর্গুমেন্ট' বা 'নরত্ববাচক যুক্তি' (আমি আমার 'আই.ডি নিয়ে কূটকচালি' লেখাটিতে এ নিয়ে বিষদভাবে লিখেছিলাম। লেখাটি সিলিকন ভ্যালী থেকে প্রকাশিত মাসিক পড়শী পত্রিকায় আর পরে দৈনিক ভোরের কাগজে ছাপা হয়েছিলো)।

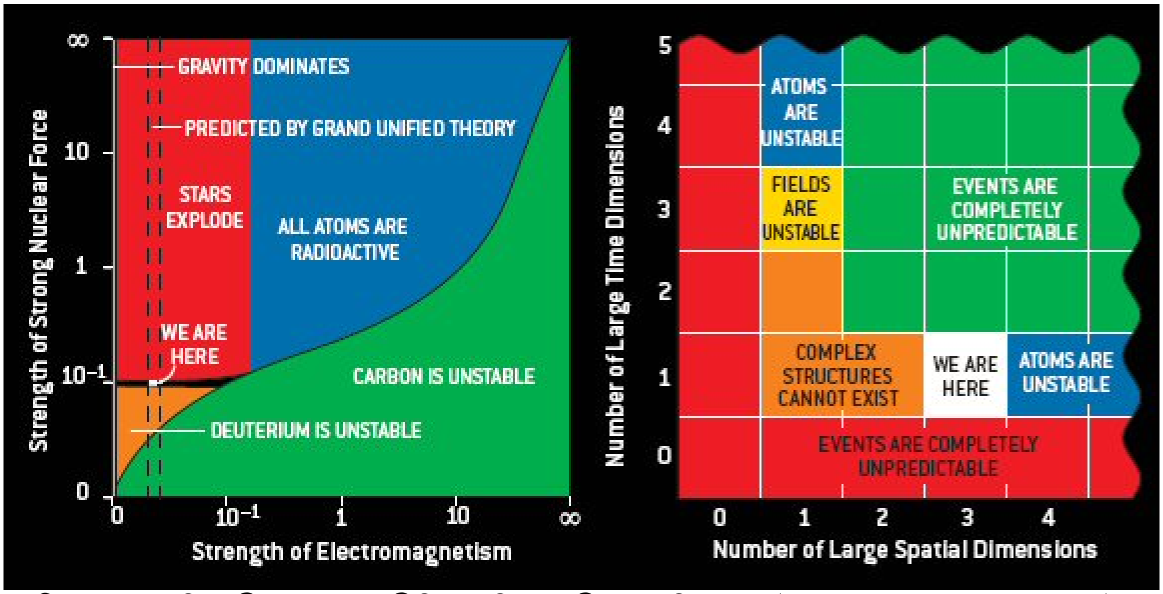

ছবি২: *অনেক বিজ্ঞানী বলেন খুব সীমিত পরিসরে জীবনের বিকাশ ঘটেছে; এমন কেন হয়েছে তার উত্তর পেতে হলে ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে পৃথিবীতে প্রাণ এবং মানুষের উপস্থিতির দিকে তাকিয়ে।*

কিছুদিন আগেও বিজ্ঞানীরা অনেকটাই হতবিহবল ছিলেন এই ভেবে যে এই রহস্যময় যোগাযোগ গুলো (অ্যান্থ্রোপিক নম্বরগুলো) আমাদের অস্তিত্বের পেছনে কেন এতটাই জরুরী হয়ে উঠল। আই.ডি ওয়ালারা স্বভাবতই এর পেছনে তাদের তথাকথিত 'ইন্টেলিজেন্ট এজেন্ট' এর হাত দেখতে পেতেন, আর আই.ডি বিরোধীরা বলতেন এ নিতান্তই 'কাকতালীয়' ব্যাপার, যাকে বলে 'ঘটনাচক্রের সমাপতন'

(coincidence)। অনেকে আবার এই দু’দলের মাঝামাঝি একটা অবস্থানে থেকে ভাবতেন, আমরা এখনো পরিপূর্ণ তত্ত্ব সম্পর্কে জানি না; কাজেই হলফ করে কিছুই বলা যাচ্ছে না। বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং ১৯৮৮ সালে এমনি ধরনের একটি ধারণা ব্যক্ত করে বলেন :

‘বিজ্ঞানের যে সূত্রগুলো সম্বন্ধে আমরা বর্তমানে অবগত, তাতে অনেক মৌলিক সংখ্যা রয়েছে। যেমন, ইলেকট্রনে বৈদ্যুতিক চার্জের পরিমান, প্রোটন-ইলেকট্রনের মধ্যকার ভরের অনুপাত ইত্যাদি। আমরা এখনো, অন্তত এই মুহূর্তে - কোন ধরনের তত্ত্বের সাহায্যে এই সংখ্যাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারছি না - আমরা কেবল পর্যবেক্ষণ দ্বারাই এগুলো সম্বন্ধে জানতে পেরেছি। এমন হতে পারে আমরা কোন দিন ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব আবিস্কার করব আর সেগুলো সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বানী করতে পারব, কিন্তু এটাও হতে পারে যে, ও সংখ্যাগুলোর সবগুলোই কিংবা অনেকগুলোই এক মহাবিশ্ব থেকে আরেক মহাবিশ্বে ভিন্ন রকম হবে, এমনকি একই মহাবিশ্বেও অন্যরকম হতে পারে। কিন্তু অত্যাশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে সংখ্যাগুলোর মান খুব সূক্ষভাবে সমন্বিত আছে যা আমাদের জীবনের বিকাশকে সম্ভব করে তুলেছে।’

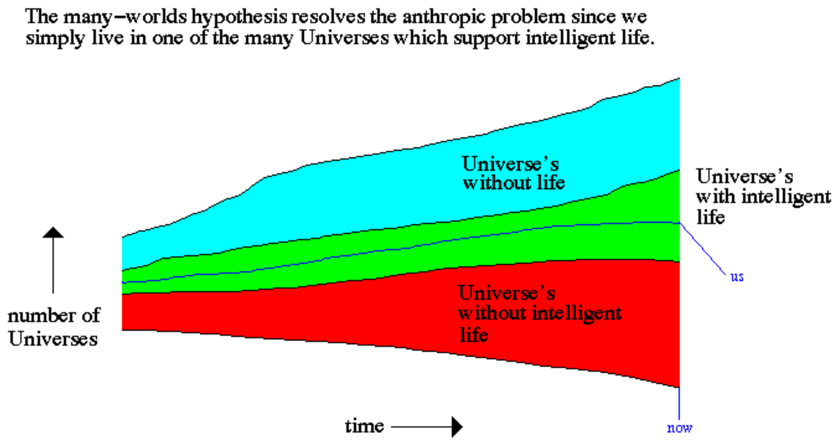

ছবি ৩: *মালটিভার্স হাইপোথিসিস অ্যান্থ্রোপিক আর্গুমেন্টের একটি সহজ সমাধান দেয়।*

যেহেতু বিজ্ঞানীরা এ সমস্ত রহস্যময় ঘটনার পেছনে কোন কারণ বা থিওরী খুঁজে পাচ্ছিলেন না - ওই সূক্ষ-সমন্বয় আর নরত্ববাচক যুক্তিগুলো নিয়ে বিজ্ঞানীদের অবচেতন মনে একটা খচখচানি থেকেই গিয়েছিল; মালটিভার্স তত্ত্ব তা থেকে অনেকটাই মুক্তি দিতে পেরেছে। সাদা মাঠা কথায় এ তত্ত্ব বলছে যে, হাজারো-লক্ষ-কোটি মহাবিশ্বের ভীরে আমাদের মহাবিশ্বও একটি। স্রেফ সম্ভাবনার নিরিখেই এমনি একটি মহাবিশ্বে চলকগুলোর মান এমনিতেই অমন সূক্ষভাবে সমন্বিত হতে পারে, অন্যগুলোতে হয়ত হয়নি। আমাদের মহাবিশ্বে চলকগুলো কোন একভাবে সমন্বিত হতে পেরেছে বলেই এতে প্রাণের উন্মেষ ঘটেছে; এতে এত আশ্চর্য হবার কিছু নেই! অধ্যাপক রীস সেটিই খুব চমৎকারভাবে একটি উপমার মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন :

‘অসংখ্য মহাবিশ্বের ভীরে আমাদের মহাবিশ্বও একটি। অন্য মহাবিশ্বে বিজ্ঞানের সূত্র আর

চলকগুলো হয়ত একেবারেই অন্যরকম হবে।... কাজেই ঘড়ির কারিগরের সাদৃশ্য এখানে একেবারেই অচল। তার বদলে বরং আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ডকে অনেকটা পরিত্যক্ত সেকেন্ড হ্যান্ড কাপড়ের দোকানের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। ***দোকানের মজুদ যদি বিশাল হয় তবে দোকানের কোন একটি জামা আপনার গায়ে ঠিকমত লেগে গেলে আপনি নিশ্চয় তাতে বিস্মিত হবেন না!*** *ঠিক একইভাবে আমাদের মহাবিশ্ব যদি ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য মহাবিশ্বের একটি হয়ে থাকে, দোকানের একটি জামার মতই সূক্ষ-সমন্বয় দেখে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'*

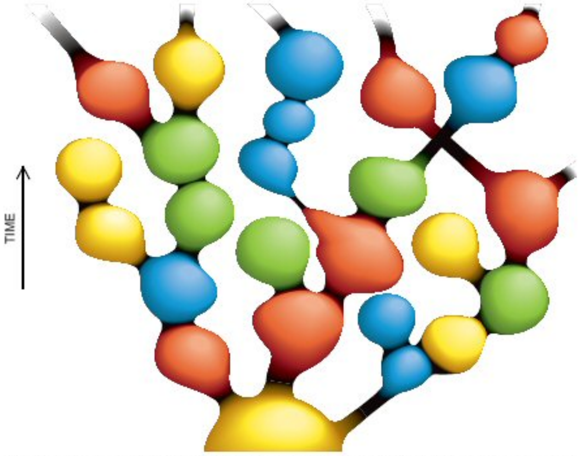

SELF-REPRODUCING COSMOS appears as an extended branching of inflationary bubbles. Changes in color represent "mutations" in the laws of physics from parent universes. The properties of space in each bubble do not depend on the time when the bubble formed. In this sense, the universe as a whole may be stationary, even though the interior of each bubble is described by the big bang theory.

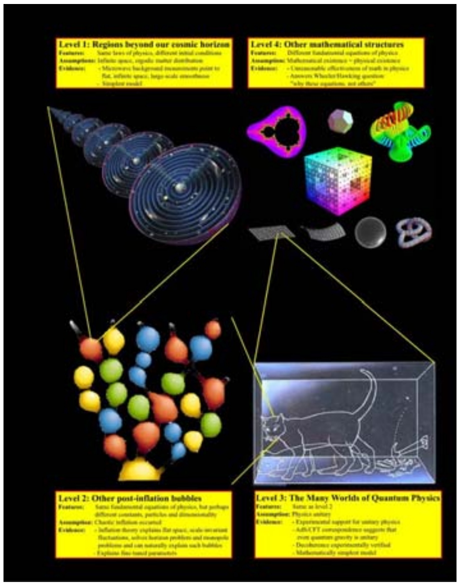

ছবি ৪: কেওটিক ইনফ্লেশন মডেল এবং অনন্ত মহাবিশ্ব: *সৃষ্টির উষালগ্নে ইনফ্লেশনের মাধ্যমে সম্প্রসারিত বুদ্বুদ (Expanding Bubbles) থেকে আমাদের মহাবিশ্বের মতই অসংখ্য মহাবিশ্ব তৈরী হয়েছে, যেগুলো একটা অপরটা থেকে সংস্পর্শবিহীন অবস্থায় দূরে সরে গেছে।*

কাজেই এই ধারণা অনুযায়ী আমাদের মহাবিশ্ব যাকে এতদিন প্রকৃতির পুরো অংশ বলে ভেবে নেওয়া হত, আসলে হয়ত এটি এক বিশাল কোন মহাজাগতিক দানবের খুব ক্ষুদ্র অংশবিশেষ ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের অবস্থাটা এতোদিন ছিল সেই বহুল প্রচলিত 'অন্ধের হস্তি দর্শন' গল্পের অন্ধ লোকটির মত - হাতীর কান ছুঁয়েই যে ভেবে নিয়েছিলো ওইটাই বুঝি হাতীর পুরো দেহটা! এখানেই কিন্তু গল্প শেষ নয়। এই মালটিভার্স থিওরীর বাই প্রোডাক্ট বা উপজাত হিসেবে আবার ইদানিং উঠে এসেছে আরো এক ডিগ্রী মজাদার তত্ত্ব - সমান্তরাল মহাবিশ্ব বা প্যারালাল ইউনিভার্স। সমান্তরাল মহাবিশ্ব নিয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভিড ডেটচস সম্প্রতি একটি বই লিখেছেন 'The Fabric of Reality: The Science of Parallel Universes - And Its Implications' নামে। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর পাশাপাশি সমান্তরাল মহাবিশ্বের ধারণা বৈজ্ঞানিক সাময়িকীগুলোতেও ঠাঁই করে নিয়েছে। ২০০৩ সালের মে মাসের সায়েন্টিফিক আমেরিকানের সঙ্খ্যায় ম্যাক্স টেগমার্ক 'Parallel Universes' নামের একটি প্রবন্ধ লেখেন। লেখাটিতে টেগমার্ক তিনটি মডেলের সাহায্যে অত্যন্ত বিস্তৃত ও আকর্ষনীয় ভঙ্গিতে 'প্যারালাল ইউনিভার্স' এর ধারণাকে পাঠকদের মাঝে তুলে ধরেন (প্রবন্ধটি মুক্তমনা ওয়েব সাইটের বিজ্ঞানের পাতায় রাখা

আছে)। প্যারালাল ইউনিভার্সের তত্ত্ব বলছে যে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লক্ষ কোটি মহাবিশ্বের মধ্যে কোন কোনটি যে আকার, আয়তন আর বৈশিষ্ট্যে একদম ঠিক ঠিক আমাদের মহাবিশ্বের মতই হবে না, এমন তো কোন গ্যারান্টি নেই। পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলোও সেই মহাবিশ্বে একই রকমভাবে কাজ করার কথা। ম্যাক্স টেগমার্ক আমাদের জানা গনিতের সম্ভাবনার নিরিখেই হিসেব করে দেখিয়েছেন যে, এই মহাবিশ্ব থেকে পায় $10^{10^{28}}$ মিটার দূরে আপনারই এক 'আইডেন্টিকাল টুইন' হয়ত কম্পিউটারের সামনে বসে এই লেখাটি পড়ছে, তা আপনি কোন দিন হয়ত জানতেও পারবেন না!

বেশ বুঝতে পারছি মাল্টিভার্সের ধারণাই হয়ত পাঠকদের অনেকে হজম করতে পারছেন না, তার উপর আবার প্যারালাল ইনিভার্স, আইডেন্টিকাল টুইন - হেন তেন চলে আসায় নিশ্চয় মাথা তালগোল পাকিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, উপরের ধারণা, কিংবা তত্ত্বগুলো যতই আজগুবি মনে হোক না কেন ওগুলো নির্মাণ করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা পদার্থবিজ্ঞানের কোন নিয়ম নীতি লংঘন করেননি।

তত্ত্ব হিসেবে মাল্টিভার্সের ধারণা যে সমালোচনার সম্মুখীন হয়নি তা নয়। যথেষ্টই হয়েছে। মাল্টিভাস নামের এই বিপ্লবাত্মক ধারণার প্রথম সমস্যা হল, এ ধারণা যে সঠিকই তা এই মুহূর্তে পরীক্ষা করে বলবার কোন উপায় নেই। কার্ল পপার 'ফলসিফায়েবিলিটি'র যে বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞানের সংজ্ঞা হিসেবে নির্ধারিত করে রেখেছেন, তার আওতায় কিন্তু মাল্টিভার্স এখনও পড়ে না। কার্লপপারের অনুসারীরা বলেন, গাণিতিক বিমূর্ততায় ঠাসা মাল্টিভার্স বা অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণা যতটুকু না বাস্তবতার কাছাকাছি, তার চাইতে ঢের বেশী কাছাকাছি অধিপদার্থবিদ্যার (metaphysics)। কাজেই এটি বিজ্ঞান হয় কি করে? কিন্তু মাল্টিভার্সের সমর্থকদেরও যুক্তির কোন অভাব নেই। তারা বলেন- ওই অধিপদার্থবিদ্যা আর পদার্থবিদ্যার মাঝখানের সীমারেখাটা যতই দিন যাচ্ছে ততই ছোট হয়ে আসছে। অতীতে আমরা দেখেছি পর্যবেক্ষনবিরোধী বহু তত্ত্বই - যেমন গোলাকার পৃথিবীর ধারণা, অদৃশ্য বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্র, উচ্চ গতিতে ভ্রমণকালে সময় শ্লথতা, কোয়ান্টাম উপরিপাতন, স্থান-কালের বক্রতা, কৃষ্ণগহবর ইত্যাদি সবকিছুই বিজ্ঞানের অংশ হয়ে গেছে। অনন্ত মহাবিশ্ব সেই তালিকায় এক নতুন সংযোজনমাত্র।

দর্শনশাস্ত্রে 'অক্কামের ক্ষুর' নামে একটি সূত্র প্রচলিত আছে। সোজা বাংলায় এই সূত্রটি বলে - অনর্থক বাহুল্য সর্বদাই বর্জনীয়। আইডির সমর্থক অধ্যাপক জর্জ এলিস অক্কামের ক্ষুরকে ব্যবহার করেছেন মাল্টিভার্সের ধারণার বিরুদ্ধে, বলেছেন এই তত্ত্ব অক্কামের ক্ষুরের সুস্পষ্ট লংঘন। তাঁর যুক্তি হল, একটা মহাবিশ্ব দিয়েই যখন সমস্যা সমাধান করা যায়, হাজার কোটি মহাবিশ্ব টেনে এনে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা আসলে বাতুলতা মাত্র, অনর্থক অপচয়। কিন্তু এ যুক্তিও ধোপে টেকেনি। যেমন, অধ্যাপক ভিকটর স্টেঙ্গর তার 'টাইমলেস রিয়ালিটি' এবং 'হ্যাস সায়েন্স ফাউন্ড গড' বইয়ে এই যুক্তি খন্ডন করে বলেন, পদার্থবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক তত্ত্বগুলোর কোনটাই অসংখ্য মহাবিশ্বের অস্তিত্বকে বাতিল করে দেয় না। বরং যেখানে লিন্ডের তত্ত্ব কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে অসংখ্য মহাবিশ্ব সৃষ্টির দিকেই ইঙ্গিত করছে, সেখানে কেউ যদি অযথা 'বাড়তি হাইপোথিসিস' আরোপ করে বলেন আমাদের এই মহাবিশ্ব ছাড়া আর কোন মহাবিশ্ব নেই, কিংবা কখনই তৈরী হওয়া সম্ভবপর নয়, তবে সেটাই বরং হবে অক্কামের ক্ষুরের লংঘন। বলা বাহুল্য, লিন্ডের গবেষণা থেকে বেরিয়ে আসা সমাধানের ভুল ধরিয়ে দিয়ে নিজের সজ্ঞাত ধারণাটি প্রামাণ করার দায়িত্ব থাকছে কিন্তু ওই দাবীদারদের ঘারেই -যারা একটিমাত্র মহাবিশ্বের ধারণায় আস্থাশীল । এখন পর্যন্ত কেউই সে ধরণের কোন 'স্পেশাল নিয়ম' হাজির করতে পারেননি যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে কেবল একটি মহাবিশ্বই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে, অন্যগুলো বাতিল হয়ে যাবে।

সম্প্রতি কানাডার প্রিমিয়ার ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক লি স্মোলিন একটু অন্যভাবে সমস্যাটা নিয়ে ভেবেছেন। *কেন আমাদের মহাবিশ্বই টিকে রইল, অন্যগুলো রইলোনা* - এ প্রশ্নটির সমাধান দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন বায়োলজি বা জীববিদ্যা হয়ত এক্ষেত্রে আমাদের পথ দেখাতে পারে। জীববিজ্ঞানে এ ধরনের ঘটনার হাজারো উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। কড মাছ মিলিয়ন মিলিয়ন ডিম পাড়ে, তার মধ্যে খুব কমই শেষ পর্যন্ত নিষিক্ত হয়, আর নিষিক্ত ডিম থেকে জন্ম নেয়া অধিকাংশ পোনাই আবার বিভিন্ন কারণে মারা যায়, কিংবা অন্য মাছদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, শেষ পর্যন্ত দেখা যায় খুব কম পোনাই টিকে থাকে আর তারপর পূর্ণাংগ মাছে পরিণত হতে পারে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখিয়েছেন যে একটা কড মাছের ডিমের নিরানব্বই শতাংশই প্রথম মাসে কোন না কোন ভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, আর বাকি যা বেঁচে থাকে তারও নব্বই ভাগ প্রথম বছরেই ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষ সহ প্রতিটি স্তন্যপায়ী প্রাণীরই কোটি কোটি স্পার্মের প্রয়োজন হয় কেবল এটি নিশ্চিত করতে যে এদের মধ্যে একটি মাত্র স্পার্মই বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ডিম্বানুকে নিষিক্ত করবে আর শেষপর্যন্ত পরবর্তী প্রজন্মকে টিকিয়ে রাখবে। অর্থাৎ প্রকৃতি তুলনামুলকভাবে বেশী উপযুক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারীদের টিকিয়ে রাখে। এ ব্যাপারটিকেই চলতি কথায় *যোগ্যতমের বিজয়* বা 'সার্ভাইবাল অব ফিটেস্ট' বলা হয়। ডারউইন প্রকৃতির এই নির্বাচন প্রক্রিয়ারই নাম দেন 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' যার মাধ্যমে তিনি জীবজগতের বিবর্তনকে সার্থকভাবে ব্যাখ্যা করতে পেরেছিলেন।

ছবি ৫: *লি স্মোলিন: কেন আমাদের মহাবিশ্বই টিকে রইল - এ প্রশ্নটির সমাধান দিতে ডারউইনের বিবর্তনবাদ হয়ত পথ দেখাতে পারে।*

লি স্মোলিন ভাবলেন জীবজগতের বিবর্তনের নিয়মের মত 'কিছু একটা' সামগ্রিকভাবে মহাবিশ্বের বিবর্তনের জন্যও প্রযোজ্য হতে পারে কিনা। ইনফ্লেশনের ফলশ্রুতিতে মহাবিশ্বের ইতিহাসে যে অগুনতি সিঙ্গুলারিটি তৈরী হয়েছিলো, এমনও তো হতে পারে যে, এদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত একটিমাত্রই টিকে রইল, যেভাবে মানবদেহে নিষেক ঘটানোর অভিপ্রায়ে মিলিয়ন শুক্রানুর মধ্যে টিকে রয় একটিমাত্র স্পার্ম বা শুক্রানু। তাহলে কি যোগ্যতম শুক্রানুর মত কোন এক যোগ্যতম সিঙ্গুলারিটি থেকেই 'প্রাকৃতিক নির্বাচনের'

মাধ্যমে জন্ম নিয়েছে আমাদের এই পরিচিত মহাবিশ্ব? কে জানে, হতেও তো পারে! তাই যদি হয়, তবে 'ফাইন-টিউনিং' আর 'অ্যান্থ্রোপিক আর্গুমেন্ট'-এর জন্য অতিপ্রাকৃত স্বর্গীয় সমাধান খুঁজে আর লাভ নেই। কারণ ডারউইনীয় বিবর্তনবাদী ধারণা বলছে হয়ত এ প্রকারণগুলোই আমাদের মহাবিশ্বকে অন্যগুলো থেকে অধিকতর 'যোগ্যতম' হিসেবে আলাদা করে দিয়েছিলো! তাই এটি টিকে গেছে। অধ্যাপক ভিকটর স্টেঙ্গর বলেন :

> *'The idea of the evolution of universes [Lee Smolin's method] is clearly akin to Darwin's theory of biological evolution. In both cases we are faced with explaining how unlikely complex, nonequilibrium structures can form without invoking even less likely supernatural forces.'*

অনন্ত মহাবিশ্বের সমস্যা সমাধানে লি স্মোলিনের এই বিবর্তনবাদী দর্শন খুব আকর্ষনীয় সমাধান দিলেও এটি জ্যোতির্পদার্থবিদদের কাছ থেকে কখনই তেমন সমর্থন পায়নি। এর কারণ মুলতঃ দুটি। অধিকাংশ পদার্থবিদদের সবাই পদার্থবিদ্যার জানা নিয়ম নীতির মধ্যে থেকেই এই রহস্যের সমাধান চান- হঠাৎ করেই এক ভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক নিয়মের মাধ্যমে একধরনের 'গোঁজামিল' দেওয়া ব্যাখ্যা নয়; আর তাছাড়া লি স্মোলিন যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের কথা বলছেন তার কোন গানিতিক মডেল উপহার দিতে পারেন নি যা পদার্থবিদদের কাছে গ্রহণযোগ্যতার এক অন্যতম পূর্বশর্ত।

যতদিন না এই শর্ত পূরণ হচ্ছে ততদিন কিন্তু থেকে যাচ্ছে আমাদের মহাবিশ্বের বাইরেও হাজার-কোটি-অনন্ত মহাবিশ্বের অস্তিত্বের এক বিশাল সম্ভাবনা আর একই সাথে থেকে যাচ্ছে এই বিশ্বব্রহ্মান্ডের বুকে কোথাও না কোথাও আপনার যমজ ভাই থেকে যাবার সম্ভাবনাও, যে ভাইটির সাথে কোন দিনই হয়ত আপনার মোলাকাত হবে না!

ইমেইলঃ charbak_bd@yahoo.com

ডারউইন ডে : ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০০৬